মানববিদ্যা গবেষণাপত্র ॥ পঞ্চম সংখ্যা ॥ আষাঢ় ১৪২৮ ॥ জুলাই ২০২১ ॥ ISSN 2518-5853
কলা অনুষদ ॥ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ

সেলিম আল দীনের *কিত্তনখোলা* নাটকে মিথের মিথষ্ক্রিয়া

মোঃ তাশহাদুল ইসলাম তারেক*

গবেষণা-সারসংক্ষেপ: বাংলাদেশ-বাঙালি সংস্কৃতি ও দার্শনিক মূলরেখা ঘিরেই সেলিম আল দীনের (১৯৪৯-২০০৮) শিল্পীজীবন আবর্তিত হয়েছে। তিনি তাঁর জন্মভূমিতে জাতিসত্তার শেকড়ের উপর দাঁড়িয়ে স্বঅস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য নিয়ে বিশ্বমুখী হতে চেয়েছেন। সেক্ষেত্রে জাতির প্রতিনিধি হিসেবে তিনি নাট্যচর্চার ক্ষেত্রকে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি ইতিহাস থেকে জন্মসূত্র আবিষ্কার করে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নির্মাণে অবদান রাখতে চেয়েছেন। তাই তাঁর শিল্পতত্ত্বগুলো একই বিশ্বাসের পরিপূরকরূপে জন্ম নিয়েছে। সেই বিশ্বাসের নাম "দ্বৈতাদ্বৈতবাদ"। নাটকে "দ্বৈতাদ্বৈতবাদ" বা মহাজগতের সকল কিছুর আন্তঃসম্পর্কের মাধ্যমে এক অভেদাত্মক উপলব্ধিতে পৌঁছতে তিনি শিল্পচর্চার নানা পর্যায়ে নানা ধরনের আঙ্গিক ও বিষয় উদ্‌ঘাটন করেছেন। আবার অনেকক্ষেত্রে পৌরাণিক বিষয়কে আপন ব্যাখ্যায় সমকালীন করে তুলেছেন। নাট্যকারের নন্দনচেতনায় প্রতিফলিত প্রাচীন মিথগুলো কোনো কোনো নাটকে আধুনিক মানুষের জীবনযাত্রায় এবং প্রবহমান সামাজিক মূল্যবোধে যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক এবং ভিন্নতর ব্যাখ্যায় উপস্থাপিত হয়েছে। তাঁর নাটকের বিষয়বস্তুতে কখনো তিনি মিথকে ভেঙেছেন কখনোবা উল্টো পথে ধাবিত করে নিরীক্ষা করেছেন তার ফলাফলকে। কিন্তু সে সকল বিষয় বা আঙ্গিক বা দর্শন কখনই বাঙালির ঐতিহ্য-ইতিহাসবঞ্চিত নয়। এই গবেষণাপ্রবন্ধটি সেলিম আল দীনের *কিত্তনখোলা* নাটকে মিথের মিথষ্ক্রিয়া উদ্‌ঘাটনে ও বিশ্লেষণের একটি প্রমাণ। উল্লেখ্য যে, বাঙালি জাতিসত্তার সাংস্কৃতিক-দার্শনিক-রাজনৈতিক-নৃতাত্ত্বিক স্বরূপ অনুসন্ধান ও তার মাধ্যমে প্রাচ্যে প্রচলিত মিথ এবং ধর্মীয় ঘটনার মাধ্যমে শৈল্পিক রূপ সৃষ্টি সেলিম আল দীনের শিল্প-সাধনার মূল লক্ষ্য। ফলে সেলিম আল দীনের *কিত্তনখোলা* নাটকে মিথের মিথষ্ক্রিয়ার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনই এই গবেষণা প্রবন্ধের প্রধান লক্ষ্য।

সত্তরের দশকে সেলিম আল দীন যে নাট্যরচনা শুরু করেন তা ছিল ইউরোপীয় নাট্যাঙ্গিক প্রভাবিত। কিন্তু আশির দশকে মধ্যযুগের বাংলা নাট্য নিয়ে গবেষণাকালে

* এম.পি.এ. (থিসিস গ্রুপ), নাট্যকলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

বাংলা নাট্যের ঐতিহ্য তাকে বিশেষভাবে আলোড়িত করে। বাংলা নাটকের প্রচলিত ইউরোপীয় গড়ন পরিত্যাগ করে বাংলা নাটকের নিজস্ব ঐতিহ্যের আলোকে আধুনিক নাট্যাঙ্গিক নিয়ে তিনি নিরীক্ষা শুরু করেন। মূলত "দ্বৈতাদ্বৈতবাদী"— শিল্পতত্ত্বে বিশ্বাসী হয়ে তিনি তাঁর আজীবনের সৃষ্টিশীলতার নন্দনদর্শনে যাত্রা করেছেন। বলা যায় তাঁর শিল্পীস্বভাবের সহজাত প্রবণতাই ছিলো অবিরাম নিরীক্ষা তাই প্রতিটি নতুন নাটকেই তিনি "দ্বৈতাদ্বৈতবাদের" বৈচিত্র্যপূর্ণ সম্ভাবনার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। প্রাচ্যের সর্বভেদবিলাপী দর্শন "দ্বৈতাদৈতবাদের" চেতনায় তিনি নাটককে আকাশ-আলো-প্রাণীকুল-নিসর্গময় মহাবিশ্বে নীত করতে চেয়েছেন, যেখানে নাটক হবে "A whole life–এর ধারক ও প্রকাশক।" (রহমান ২০০৯: ৩৮) সেই সূত্র ধরে তিনি কথানাট্য ও পাঁচালি আঙ্গিকে প্রবেশ করেন। তাঁর নাট্যরচনাশৈলীতে মহাকাব্যিক বাস্তবতা, বর্ণনাত্মক নাট্যরীতি, কথানাট্য, আধুনিক পাঁচালি আঙ্গিক, নব্যনৃগোষ্ঠী নাট্য প্রভৃতি সংযোজন ঘটে। তিনি নাটকে ভাষার গীতল ব্যবহার কাজে লাগান কথকতার ভঙ্গিতে যেন বর্ণনাত্মকরীতিতে চরিত্রগুলোর রূপ রূপান্তর মহাকাব্যিকতা অর্জন করে। নাট্যকার এই "বর্ণনাত্মকরীতিকে" "কথানাট্য" বলে অভিহিত করেন যার মাধ্যমে নাটকের অভিনয়ে ইউরোপীয় অনুকরণতত্ত্বের বদলে অভিনয়কে "জীবনের ব্যাখ্যা" হিসেবে গ্রহণ করা যায়। ফলে "বর্ণনা এবং সংলাপ নাটকে দোঁহে অভেদ বা 'অদ্বয়' হয়ে ওঠে।" (গালিব ও জামিল ২০১০: ৮৩) মূলত তিনি নাট্যদর্শনে দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্ত্বে বিশ্বাসী এবং নাটকের বিষয়বিন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি গ্রামীণ সমাজের নানা বিষয় ও নিম্নবিত্ত মানুষের যাপিত জীবনকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। আবার অনেকক্ষেত্রে তিনি নাটকের বিষয়বস্তু হিসেবে মিথকেও বেছে নিয়েছেন। সেলিম আল দীন রচিত মিথ-নির্ভর নাটক লক্ষ করে দেখা যায় মিথকে তিনি নানাভাবে ব্যবহার করেছেন নাটকে। যেমন মিথকে কখনো নাটকের আঙ্গিকে, বিষয়বস্তুতে বা বিষয়বস্তুর অন্তরালে ব্যবহার করেছেন। আবার কখনো নাটকের বিষয়বস্তুতে সরাসরি মিথকে ব্যবহার করে পাঠকের কাছে নবতর ব্যাখ্যায় উপস্থাপন করেছেন। *কিত্তনখোলা* নাটকে সেলিম আল দীন প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তবতাকে বিভিন্ন পুরাণ, উপকথা ও কিস্যার আদলে উপস্থাপন করবার নিজস্ব একটা শৈলী আত্মস্থ করেছেন। গবেষক লুৎফর রহমানের মতে—

> এ নাটকে বিভিন্ন জাতি ধর্ম বিশ্বাস মানুষের পুরাণ বাঙালির জীবন চর্চার সঙ্গে একাকার অথচ সঙ্গত নয়। এ শৈলী নাট্যবস্তুকে অতি অনায়াসেই বৈশ্বিকতা দান করে। আপন আত্মার প্রতিধ্বনি শোনে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তেরই একজন সচেতন পাঠক দর্শক তার নাটকের সঙ্গে আপন আত্মার সাদৃশ্য আবিষ্কার করে তৃপ্ত হন। বাইবেল, কুরআন, হিন্দু পুরাণ, গ্রিক, রোমক পুরাণ, বাঙলা লোকগাঁথা, সাংখ্য, বৌদ্ধ দর্শন, বিভিন্ন উপজাতীয় পুরাণ, নৃত্য-সঙ্গীত ইত্যকার ধর্ম-বর্ণ-জাতি সংস্কার-সংস্কৃতির অদ্ভুত নিরাকরণ সেলিম আল দীনের নাট্যশরীরে সহজলভ্য। (রহমান ২০০৯: ১৩৫)

এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় সেলিম আল দীনের *কিত্তনখোলা* নাটকে মিথের মিথষ্ক্রিয়া। উক্ত বিষয়ের আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে মিথের সংক্ষিপ্ত তাত্ত্বিক আলোচনা

উপস্থাপন গুরুত্বপূর্ণ। কেননা বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের বিষয়ে "মিথের মিথষ্ক্রিয়া" শব্দদুটি উল্লেখ করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে মিথ সম্পর্কিত আলোচনা প্রাসঙ্গিকভাবেই উপস্থাপনের দাবি রাখে। মিথ অর্থ পুরাণ, পুরাকাহিনী, অতিকথা, উপকথা, পৌরাণিক কথা। মিথ হচ্ছে আদিম মানুষের স্বপ্ন-কল্পনা-কৃত্যের সমষ্টি। চন্দ্র-সূর্য্যের আবর্তনখচিত আকাশ, ঋতুর ঘূর্ণনশীলতা, জীবন মৃত্যুর অনুদ্‌ঘাটিত জটিল রহস্যের এক সরল অথচ আদিম ব্যাখ্যা হচ্ছে মিথ। Myth (মিথ) "প্রাচীনকাল থেকে পুরুষানুক্রমে প্রবহমান কাহিনী, বিশেষ কোনো জাতির আদি ইতিহাস সম্পৃক্ত বিশ্বাস ও ধারণা, অতিকথা।" (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১২: ০৯) "মিথ" কথাটি এসেছে গ্রিক শব্দ "মিথোস" থেকে, যার অর্থ "শব্দ" বা "লোককথা" বা "সত্য ঘটনা"। এ থেকে বোঝা যায় যে, মূলত মানুষের মুখে মুখেই এই মিথ অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে পড়তো। "মিথ" শব্দটি আরও একটি শব্দের সঙ্গে জড়িত আর তা হলো "মিও" যার অর্থ "শেখানো" অথবা "গোপন রহস্যের সন্ধান দেওয়া"। খ্রিস্টপূর্ব ৭ম বা ৮ম শতকের দিকে কবি হোমারও এই অর্থেই মিথ শব্দটিকে ব্যবহার করেছিলেন। মার্কিন কবি রেজিনাল্ড শেফার্ড বলেন—

> Myth also similar to poetry in its formal operations. Myth is essentially metaphorical: like poetry, it translates 'feelings' in the sense of emotions and thoughts into 'feelings' in the sense of physical sensations. (কাদির ২০১৮, ১ জুন)

মিথ মূলত প্রাচীন কালের কাহিনী যাতে আছে অতিপ্রাকৃত প্রাণী, পূর্বপুরুষ বা মহাবীর ও বীরাঙ্গনা। ঐসব কাহিনীতে প্রকাশ পায় জগৎ ও জীবন সম্পর্কে মানুষের মৌলিক ধারণা, প্রকৃতির নানা বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা, মন-মানসিকতার স্বরূপ, রীতি-নীতি-প্রথা বা সমাজের আদর্শ। "প্রাক-শিক্ষিত সমাজে সত্য ঘটনা হিসেবে মেনে নেয়া পূর্বকালের অতিমানবদের কাহিনী, দেবতা, জগৎ, মানুষ, প্রাণী ও গাছপালা প্রভৃতি উৎপত্তির কাহিনীও মিথ।" (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১২: ০৯) *Chambers 21st Century Dictionary*-তে মিথকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে "An ancient story that deals with gods and heroes, especially one used to explain some natural phenomenon." (Robinson 1996: 905) আবার *Standard Dictionary of Folklore*-এ বলা হয়েছে—

> A story, presented as having actually occured in a previous age, explaining the cosmological and supernatural traditions of people, their gods, heroes, cultural traits, religious beliefs etc. (Leach 1972: 778)

মিথ প্রসঙ্গে H.B. Franklin বলেন, "Myths may be events of the mind as they are dramatized innarrative form that is, in terms of natural or historical events." (Franklin, 1996: 56) মিথ কেবল দেবতা, জগৎ, মানুষ, প্রাণী, গাছপালা প্রভৃতি উৎপত্তির কাহিনীর বর্ণনাই দেয় না বরং এই দেবতা, জগৎ, প্রাণী, গাছপালা

যেগুলোর মধ্য দিয়ে মানুষ আজকের মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে এসব কিছুরও ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করে। শুধু তাই নয়, যে সব পৌরাণিক ঘটনার মধ্য দিয়ে মানুষ নৈতিক, কর্মনিষ্ঠ, নিয়মানুগ, যৌবনশক্তিসম্পন্ন সামাজিক জীব হিসেবে রূপান্তরিত হয়েছে মিথ তারও বিবরণ দেয়। যখন থেকে ভাষার উদ্ভব ঘটেছে, ভাষার সাহায্যে মনের ভাব ব্যক্ত করা সম্ভব হয়েছে, তখন থেকেই গড়ে উঠেছে আখ্যান। প্রকাশও হয়েছে মানুষের অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি, ভবিষ্যৎ প্রকল্প, বিশ্বাসের প্রভাব সৃষ্টি, দৃষ্টান্ত। মিথ প্রবাহমান এবং ক্রমরূপান্তরশীল। মিথ ইতিহাসও বটে। কিন্তু ইতিহাস একটি logical academic জ্ঞানশাখা। মিথ লোকনির্ভর, লোকবাহিত। ভিন্ন ভিন্ন ভূমিতে মানবের সাংস্কৃতিক বিকাশের সাথে তাদের মিথ জড়িত। সেইসব মিথ জীবনবিশ্বাসের প্রতিফলন বলেই সেগুলোকে তারা টিকিয়ে রাখে। সেখানে তাদের সৃষ্টি রহস্য, ধর্মবোধ, জীবনচর্যার পদ্ধতি ও মূল্যবোধ প্রকাশিত হয়। মিথ তৈরি হতেই থাকে ক্রমাগত। তার টিকে থাকা নির্ভর করে উত্তর প্রজন্মের গ্রহণযোগ্যতার উপর। মিথ উৎপন্ন হয় কোনো মানবগোষ্ঠীর ভেতরে, সেই মানবগোষ্ঠীর জন্য। কিন্তু যোগাযোগের পরিসর বিস্তৃত হতে থাকলে কোনো কোনো মিথ সর্বমানবের হতে থাকে। ভাষার বিকাশের সাথে সাথে মিথ মৌখিক রূপ থেকে লেখ্য এমনকি সব প্রকাশ মাধ্যমে ক্রমে আশ্রয় লাভ করে। এর প্রকাশরূপ হতে পারে নানারকম—বাস্তবধর্মী-রূপকাশ্রিত বা প্রতীকী।

সেলিম আল দীনের নাটকে উঠে আসে বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কার-কুসংস্কার, ধর্মবিশ্বাস, পুরাণ, লোকপুরাণ, সামাজিক প্রথা, পোশাক, খাদ্যাভাস, কৃত্য ও আচার, উৎসব ও অনুষ্ঠান এবং অর্থনৈতিক জীবন সংগ্রামের চিত্র। আবার সেলিম আল দীনের অনেক নাটকে সরাসরি মিথের ব্যবহার এবং মিথের মিথষ্ক্রিয়া লক্ষণীয়। যেমন *কিত্তনখোলা* নাটকের মধ্যে মিথের ব্যবহার থাকলেও তা মূলত ঐতিহ্যের নবনির্মাণ-সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপান্তরের আধুনিক রেখাচিত্র। বৌদ্ধ-জাতকের পুনর্জন্মের ধারণা এবং ইতালির কবি ওভিদের *মেটামরফোসিস* কাব্যে পৌরাণিক রূপান্তরের ধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে সেলিম আল দীন নাটকটিতে তুলে এনেছেন সাম্প্রতিক বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে শোষণমুখী সমাজের রূপান্তরের বিভিন্ন চিত্র। *কিত্তনখোলা* নাটকটি "মহাকাব্যিক বাস্তবতা" বা "এপিক রিয়েলিজমে" লেখা। এ নাটকের আখ্যান ভাগ যেমন বড় তেমনি এখানে ধরা পড়েছে অসংখ্য মানুষদের জীবনের ছবি। সমালোচকের মতে—

> আমরা অতি বিস্ময়ের সাথে বাংলা নাটকের, বিশেষ করে, মঞ্চ নাটকের এক আয়োজন লক্ষ করি *কিত্তনখোলা* নামের নাটকে। এত আয়োজন, এত চরিত্র, জীবনের বহুমাত্রিক রূপ-রূপান্তর, দৃশ্যের দেশজ উপাদান, মঞ্চের প্রচলিত ধরণকে একেবারে উলটপালট করে দেয়ার এমন যাদুকরী আয়োজন আমরা ইতঃপূর্বে দেখি না।...নাটকের চলতি রূপ বা ধারণা ভেঙে যেতে দেখা যায়। মঞ্চ নাটকে পরনির্ভরশীল বুর্জোয়া ধারণাশ্রিত যে নাট্যপ্রবাহ চালু ছিল তা এখানে এসে যেন রীতিমত ধাক্কা খায়। জনজীবন হুড়মুড় করে ভেঙে যেতে থাকে, কোন আয়োজন, অপেক্ষা ছাড়া, এমন কি নাট্যকারের ভদ্রলোকি

> আয়োজনকে অস্বীকার করে একেবারে দর্শকের সাথে এক ধরনের মাটিঘেঁষা প্রেম গড়ে তুলতে থাকে। (হাসান ২০০৮: ৫৪)

এতদ্ব্যতীত *কিত্তনখোলা* নাটকে কোনো একটি সুনির্দিষ্ট মিথকে এখানে ব্যবহার করা হয়নি। বরং পৃথক একটি কাহিনীর ভেতর নানা প্রসঙ্গে মিথের ব্যবহার করা হয়েছে। এ নাটকে নাট্যকার ইচ্ছে করেই প্রাসঙ্গিকভাবে মিথের চরিত্র, মিথের গল্প, মিথের প্রতীক সংযোজন করেছেন। মানুষের জীবনের ভেতর দিয়ে মিথ প্রতিনিয়ত বাহিত হয়। বাহিত হয় বলেই সেটা টিকে থাকে। নাট্যকার *কিত্তনখোলা* নাটক রচনার সময় সে কথাটি বিস্মৃত হন না। ফলে দেখা যায় যে নানা পরিস্থিতি-পরিবেশে নানা বিশ্বাসের মানুষ তার বিশ্বাসের জায়গা থেকে বা তার পরিস্থিতির জায়গা থেকে মিথকে উপস্থাপন করেন, যা জীবনের সমান্তরালে চলে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যেভাবে মিথ ব্যবহৃত হয় *কিত্তনখোলা* নাটকেও সেভাবেই ব্যবহৃত হয়েছে। *কিত্তনখোলা* নাটকে যে যে প্রসঙ্গ থেকে মিথ আসে তা নিম্নরূপ—

১. লোককথা থেকে।
২. ধর্ম প্রসঙ্গ থেকে।
৩. যাত্রা শিল্পের অতীত প্রসঙ্গ থেকে।
৪. বাউল সাধনার দর্শন থেকে।
৫. কোরআন শরীফ থেকে।
১. জীবনে সংঘটিত অতীতকালের নানা প্রসঙ্গ থেকে।

কিত্তনখোলা নাটকে উল্লিখিত মিথ প্রসঙ্গ ব্যবহার করে সেলিম আল দীন প্রাচীন গ্রাম-বাংলার জনজীবন সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন। বলা যেতে পারে মিথের সাথে নিম্নবর্গের জনজীবনকে সমান্তরাল করে গড়ে তুলেছেন এক অভিন্ন মহাকাব্যিক কাহিনী। এ নাটকে আবহমান বাঙালি জীবনে প্রচলিত নানা ধর্ম, দর্শন, মত, চর্চার ভেতর থেকে মিথগুলোকে পাওয়া যায়। অর্থাৎ মিথগুলোর এক সমন্বিত রূপ পাওয়া যায় তা আসলে এক সময়ের বঙ্গীয় জনপদকে উপস্থাপন করে। *কিত্তনখোলা* নাটকে মিথের ব্যবহার লক্ষ করার মাধ্যমে বলা যায় নাট্যকার মিথকে ব্যবহার না করে শুধুমাত্র বিষয়বস্তুতে ব্যবহার করেছেন। যেমন—

১. বেহুলা-লখিন্দর
২. রাধা-কৃষ্ণ
৩. কাকনুস্ পাখি
৪. ইব্রাহীম (আঃ) ও নমরুদ
৫. মনসা ইত্যাদি।

সেলিম আল দীন *কিত্তনখোলা* নাটকের বিষয়বস্তুতে উল্লিখিত মিথ প্রসঙ্গের মিথষ্ক্রিয়ায় গড়ে তুলেছেন নাটকের কাহিনী। যেখানে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে ইতালির কবি ওভিদের *মেটামরফোসিস* কাব্যের পৌরাণিক রূপান্তরের গল্পটি। পুনর্জন্মের ধারণাটি

হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন বা শিখ বিশ্বাসব্যবস্থায় বর্তমান; যার বিষয়বস্তু-রূপান্তর। অর্থাৎ দেহের রূপান্তর। পুনর্জন্ম বিষয়ে *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*র দ্বিতীয় অধ্যায়ের সংখ্যাযোগে বলা হয়েছে—

> ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥
> বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্ ।
> কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ॥
> বাসানসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি
> গৃহ্নাতি নরোহপরাণি।
> তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি
> সংযাতি নবানি দেহী ॥ (ঘোষ ১৯৮৯: ২০-২২)

অর্থাৎ দেহ হত হলেও আত্মা হয় না। আত্মা সর্বদাই এক প্রকার, এর জন্ম-বৃদ্ধি, ক্ষয় হীন। হে পার্থ! যে এভাবে আত্মাকে জানে, সে কাকেই বা বধ করে বা করায়? মানুষ যেমন পুরাতন বস্ত্র ছেড়ে নতুন বস্ত্র পরিধান করে, তেমনি আত্মাও পুরাতন দেহ ছেড়ে নতুন দেহ ধারণ করে। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*র গভীর এ দর্শনকে সেলিম আল দীন তাঁর নাটকের মূল বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। নাট্যকারের অভিমত থেকে বলা যায় *কিত্তনখোলা*'তে যে দার্শনিক পটভূমি ব্যবহৃত হয়েছে সেটা হলো বৌদ্ধজাতকের পুনর্জন্মের ধারণা। বারবার পাপ করার ফলে মানুষের পুনর্জন্ম হয় বারবার। পুরাণেও এ গল্পটা বিদ্যমান। সুতরাং সেলিম আল দীন মনে করেন এই গল্পটা এদেশের সমাজ ব্যবস্থাতেই আছে। সেক্ষেত্রে তিনি উল্লেখ করেন—

> কিত্তনখোলাতে আমার দার্শনিক পটভূমি ছিলো, সেটা হলো, বৌদ্ধজাতকে মানুষের পুনর্জন্ম হলো বারবার পাপ করার ফলে। পুরাণেও গল্পটা আছে। দেবতার অভিশাপ লাগলো, ফলে কেউ পাথর হলো, কেউবা হয়ে গেল হরিণ। হঠাৎ একদিন আমার মনে হলো আমাদের সমাজ ব্যবস্থাতেই গল্পটা আছে জোতদার চোখ শাসালো, কৃষক উচ্ছেদ হয়ে গেল। সামাজিক রূপান্তর ঐ কারণে। আমরা এখানে দেখলাম যে সানাই হলো তাঁতী, তাঁতী হলো চাষী। চাষী হলো দিনমজুর, দিনমজুর হলো ফকির। প্রতিটা চরিত্র সমাজের কোন না কোন অংশ দিয়ে বদলে যাচ্ছে, রূপান্তর হয়ে যাচ্ছে। এই রূপান্তরের সঙ্গে ধ্রুপদী রূপান্তরের প্যারালাল করে দেখা। (গালিব ও জামিল ২০১০: ৫৯)

নাট্যকাহিনীতে দেখা যায় সোনাইয়ের পিতা ছিলেন জোলা বা তাঁতী। সোনাইয়ের বাবার বসতি ছিল পাবনা জেলায়। এক সময় তাদের জমিজমা ছিল; অর্থাৎ তারা সম্পন্ন গেরস্থ ছিল। সোনাইয়ের দাম্পত্য জীবন ছিল, ঘরে বউ ছিলো, সুখও ছিল। কিন্তু এখন সোনাইয়ের কিছুই নেই; অনেকটা বলতে গেলে হৃতসর্বস্ব। সোনাই আবার মৃগী রোগী। ইদুল হক কন্ট্রাক্টরের কাছ থেকে জমি বন্ধক রেখে সোনাই চার হাজার টাকা ঋণ নিয়েছিলো। পরিশোধ করতে পারে নি আজো ঋণের টাকা। এজন্য ইদু কন্ট্রাক্টর কৌশলে সোনাইয়ের শেষ সম্বল ভিটেমাটির জমিটুকুও ঋণের দায়ে কেড়ে নিতে চায়। ইদু কন্ট্রাক্টরই যেনো এ নাটকে জাতকের গল্পের এবং রূপান্তর মিথের দেবতা হয়ে ধরা দেয়। যেমন দেবতার অভিশাপে সবকিছুর রূপান্তর ঘটে যায়। তেমনি

কিত্তনখোলা নাটকে রূপান্তরের মাধ্যমে সোনাই ভিটে-মাটি ছাড়া নিঃসম্বল হওয়ার উপক্রম হয়। সোনাইয়ের ঋণের টাকা বেড়েছে; আর ইদু কন্ট্রাক্টরের জমির লোভ। ফলে উভয় চরিত্রের মধ্যে সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়েছে। সোনাই খেটে খাওয়া মানুষ; কিন্তু ইদু শোষক শ্রেণির প্রতিভূ। তবে ইদুর অতীত ইতিহাস বলে ইদুও এককালে নিম্নবিত্তেরই মানুষ ছিলো। কারণ, পঞ্চাশের মন্বন্তরে ইদুর মা সাতদিন না খেয়ে অবশেষে মণ্ডল বাড়িতে খিঁচুড়ি খেয়ে মারা গেছে। ইদু দিনমজুরী করেছে হুরমত কাজীর বাড়িতে। শরীর খাটিয়ে পেটে-ভাতে বেঁচে থেকেছে। কিন্তু সেই বেঁচে থাকার আরেক নাম সংগ্রাম। কাজীর বাড়িতে কাজ করে সারাদিনে ইদুর জুটতো একবেলা ভাত আর দুইবেলা ভাতের ফেন। তবে ইদু তার ভাগ্য বদলে নিয়েছে, নিজের বুদ্ধির জোরে সে আজ *কিত্তনখোলা* মেলা কমিটির শক্তিধর পুরুষ। একদিকে সোনাইয়ের করুণ রূপান্তর অন্যদিকে ইদু কন্ট্রাক্টরের সুখময় রূপান্তর বিধৃত হয় নাটকে—

> প্রৌঢ়। তুই যে কইলি চাইলের ব্যবসা ছাইড়া গাছি হইলেন কতাটা শুইনা আমার ছোডবেলার ছগী বুড়ির কিস্‌সসাটা মনে হইল। জ্বীনের রাজায় মানষেরে পাথর বানাইত পাথর থিক্যা গাছ গাছ থিক্যা ফল ফল থিক্যা পঙ্খী আমারও হেই দশা হইছে।
>
> সোনাই। ক্যান ফুইপা। আমার দশাটা কি ছগী বুড়ির কিসসার মতন না। দাদার বাপে করতো তাঁতের কাম কৈজুরী গেরামে পাবনায়। বাপ আছাল চাষী। আমি এখন দিনমজুর।
>
> প্রৌঢ়। টুইটামের হগল্লেই তর পুব্ব পুরুষের কথা জানে। ছগী বুড়ি কিস্‌সা কইত আর কতক্ষণ পর কইত সুর কইরা জ্বিনের রাজায় ছুঁইয়া দিল আমান মানুষ পাথর হইলো। আইজই ফিরবি মেলাথনে। (দীন ২০১৩: ৪২০)

কিত্তনখোলা নাটকের সোনাই, রুস্তম, বছির, গোলাপগাছি, বনশ্রী, ডালিমনের প্রাণের গহনে বঞ্চিত ও রূপান্তরিত জীবনের হাহাকার উচ্চারিত হয়। জীবনের সহস্র বাঁকের দেখা মেলে বিচিত্ররূপে কিন্তু জীবন, কিসের নাম? এ প্রশ্নের উত্তর মেলে না, সন্ধান মেলে না জীবনের অদৃশ্য গল্পকারের। নাট্যকার জীবন এবং জীবনের গল্পকারের অনুসন্ধানী। তাই সামাজিক রূপান্তরকে বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কিত পুরাণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করেন অবলীলায়। এই প্রৌঢ়ের মুখে শোনা যায় "ছগীবুড়ীর কিসসা জ্বীনের রাজায় মানুষেরে পাথর বানাইত—পাথর থিক্যা গাছ—গাছ থিক্যা ফল—ফল থিক্যা পংখী.. আমারও হেই দশা হইছে।" (রহমান ২০০৯: ১২৮)

'বারো মাসে তেরো পার্বণ' বাঙ্গালি সংস্কৃতি সম্পর্কে এ চিরায়ত প্রবাদটি লক্ষণীয়। গবেষক আবু সাঈদ তুলু উল্লেখ করেন, "বাঙালি সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত 'মেলা' সংস্কৃতিকে উপজীব্য করে সেলিম আল দীন রচনা করেছেন *কিত্তনখোলা* নাটক।" (তুলু ২০১৮: ৮৫) উল্লেখ্য মনাই বাবার মাজারকে কেন্দ্র করে কিত্তনখোলা গ্রামে মেলার আয়োজন হয়। মূলত প্রাচ্যে সূফিবাদের দর্শনেই মাজার সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। গবেষক দেবিদাস ভট্টাচার্যের মতে,

> সমন্বয়বাদী বাঙালি ধর্মদর্শন ইসলামকেও লৌকিক ইসলাম তথা পীরপূজা বা সূফীবাদে পরিণত করেছে। সূফী সাধকগণও ভক্ত ভগবানের সম্পর্কটি মর্ত্য প্রেমিক-প্রেমিকার (মাশুক-আসিক) উত্তপ্ত কামনা রসের মধ্য দিয়েই পেতে চেয়েছিলেন। (ভট্টাচার্য ১৩৮৯: ৩৬)

ইতিহাস থেকে জানা যায়, ভারতীয় উপমহাদেশে বিভিন্ন মুসলিম দেশ থেকে আগত ইসলাম প্রচারক আওলিয়া-দরবেশের মৃত্যুর পর তাদের কবরকে ঘিরে অসংখ্য মাজার তৈরি হয়। পরবর্তীতে সময়ের আর্বতে সেই মাজারগুলোতে ভক্তদের যাতায়াত শুরু হয় এবং ব্যক্তির নানা স্বপ্ন ও ইচ্ছে পূরণের উদ্দেশ্যে মাজারে মানত করা হয়। মানত প্রসঙ্গটি নির্দিষ্ট কোনো ধর্মের নয় বরং সকল ধর্মের অনুসারীরাই মানতের সাথে পরিচিত। কেননা গ্রাম-বাংলার মানুষ বিভিন্ন ধর্মে-বর্ণে-গোত্রে বিভাজিত হলেও তাদের সমাজ-সংস্কৃতি, সভ্যতা এক ও অভিন্ন। গ্রামীণ মেলার বিভিন্ন অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ করলে তা স্পষ্ট হয়। কারণ, বঙ্গভূমির প্রাচীন ও আদি ঐতিহ্য অসাম্প্রদায়িকতা। মনাই বাবার মাজারও এই অসাম্প্রদায়িকতার প্রতীক। যারা সমাজের নিম্নবিত্ত তারা সামান্য স্বার্থে, বেঁচে থাকার তাগিদে কিংবা রোগ নিয়াময়ের উদ্দেশ্যে মানত করে মেলায় আসে। ধর্মীয় বোধ, অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস অথবা নিজের আত্মার প্রশান্তির জন্য এসব মানত হয়ে থাকে। মাজার সংস্কৃতি এবং মানতের বিশ্বাসগুলোই মানুষের জীবনের অতীত অভিজ্ঞতার হিসেবে স্থান পায়। কারণ পূর্বপুরুষ থেকে বর্তমান পর্যন্ত অভিজ্ঞতার ফলেই নিম্নবিত্তের এসব মানুষ মাজারের মানতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। এজন্যই সেলিম আল দীন প্রাচ্যে প্রচলিত সূফিতত্ত্বের এই দর্শন থেকেই মনাই বাবার মাজার সৃষ্টি করেছেন। এতদ্ব্যতীত মেলাকে কেন্দ্র করেই বৃহদার্থে গ্রাম-বাংলার জন-সমাজের নৃ-তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক শেকড় সন্ধানী নাট্য-শরীর নির্মিত হয়; যেখানে অসংখ্য চরিত্রের সমাবেশ ঘটে। পুরাণ প্রসঙ্গকে বর্তমানের সাথে একাত্ম করতেই নাট্যকার নানা চরিত্র ও কাহিনীর সাথে পুরাণকে যুক্ত করেন। *কিত্তনখোলা*'র সোনাই, বছির, ছায়ারঞ্জন, বনশ্রী, ডালিমন সকলেই জীবনযুদ্ধে রূপান্তরের প্রতীক। কেননা সোনাই শোষিত-প্রতারিত এক মানুষ। ইদু কন্ট্রাক্টর কৌশলে মেলায় তাকে তাড়ি পান করিয়ে জুয়ার আসরে বসায় এবং তার শেষ-সম্বলটুকু কেড়ে নেয়। বছির নাটকে সোনাইয়ের প্রতিরূপ হিসেবে চিত্রিত হয়েছে। ছায়ারঞ্জনের জীবনে আছে এক মর্মান্তিক ঘটনা। ছায়ারঞ্জনের পিতা পাঞ্জাবিদের হাতে খুন হয়েছিলো আর মা ধর্ষিত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। এই অতীত তাকে সারাক্ষণ যন্ত্রণা দেয়, সে ভুলতে পারে না। তাই সে যাত্রার আসরে নেচে-গেয়ে আর কখনো মদ পান করে অতীত দুঃখ-কষ্ট ভুলে থাকতে চায়। কেননা ব্যক্তিগত ইচ্ছায় ছায়ারঞ্জনের জীবন এমন ছন্নছাড়া হয়নি। ছন্নছাড়া ছায়ারঞ্জন জীবন-জীবিকার তাগিদে নাট্যদলে অভিনয় করে। জীবিকা উপার্জনই প্রধান কথা ছায়ারঞ্জনের কাছে ধর্ম নয়। তাই জীবিকার ধর্ম ত্যাগ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করেই বলে, "আমি মুসলমান হবো।" (দীন ২০১৩: ৪৭৩) অর্থাৎ এরা সকলেই জীবিকার প্রয়োজনে সম্প্রদায়-জাতি-গোষ্ঠীর ঊর্ধ্বে

অসহায় মানব সম্প্রদায়। যাদের বেঁচে থাকার তাগিদে জীবনের রূপান্তরটা খুব সহজেই হয়। কেননা সমাজের নিম্নবিত্তের মানুষের নিকট জীবন সংগ্রামে টিকে থাকা বড় কথা ধর্ম নয়; ধর্ম তাদের কাছে বাহ্যিক অলংকার। মূলত এখানে বেঁচে থাকার তাগিদে প্রত্যেকের জীবনে এক রূপান্তরের সৃষ্টি হয়। যার ইঙ্গিত নাট্যকার নাটকের শুরুতেই উল্লেখ করেন। নাট্যকারের ভাষায়—

> আইজ যে কইবাম রূপ বদলে কথা
> পশু পঙ্খী মানুষ আদি ঋতু তরুলতাৎ
> ছয় ঋতু রূপান্তর হয় বারো মাসে
> সেই মতো মানুষেরও রূপ পরকাশে
> অদল বদল হইয়া তামাম দুনিয়া
> নানা মতে নানা রূপে দেখো বিচরিয়া। (দীন ২০১৩: ৪১৫)

কিত্তনখোলা নাটকে জীবনের এই "অদল-বদল" বা রূপান্তর "এক জনমে জনম হয় অনেক বার।" (দীন ২০১১: ১৬৩) বিধৃত হয়েছে কারো মৃত্যুতে, কারো জীবিকার তাড়নায়। যেমন কৃষকপুত্র ছায়ারঞ্জন রবিদাশ রূপান্তরিত জীবনে যাত্রার শিল্পী। বনশ্রীবালা সামাজিক-অর্থনৈতিক চাপে বেশ্যার জীবন বরণে বাধ্য; অনন্তর রূপান্তরের নিষ্ঠুর নিয়মে শুরু হয় যাত্রার অভিনেত্রীর দুঃখময় জীবন।

সেলিম আল দীন *কিত্তনখোলা* নাটকের কাহিনী নিরেট বাঙালি জীবন থেকেই শুধু গ্রহণ করেননি; বরং নাটকে সত্যিকার অর্থে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের জীবন চিত্রের সাথে মিথকে উপস্থাপন করেছেন। কেননা *কিত্তনখোলা* নাটকের কাহিনী একটি চলমান জীবনের চিত্র। তাই চলমান জীবনের চিত্রের সাথে বিভিন্ন মিথকে প্রাসঙ্গিকভাবে ব্যবহার করে নাট্যকার এক মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনা দান করেছেন। ফলশ্রুতিতে *কিত্তনখোলা* পুরাণাশ্রিত সমকালীন নাটক হিসেবে পাঠকের কাছে উপস্থাপিত হয়েছে। কারণ পুরাণের আবেদন সর্বদাই বর্তমান। এজন্য কিত্তনখোলা মেলায় যাত্রাদলের অতীত ইতিহাস থেকে পুরাণকে তুলে নিয়ে আসেন। নিম্নবিত্তের মানুষকে পুরাণের গল্পের মাধ্যমে অনেকটা নিকটবর্তী করে তোলা যায়। কেননা পুরাণের আবেদনটা সবসময়ই মানুষের কাছে আবেগী বিশ্বাস তৈরি করে। সেক্ষেত্রে কিত্তনখোলা মেলায় সুবল ঘোষের যাত্রাদলের আগমন ঘটে। গ্রামের মেলায় দূর-দূরান্তের গ্রাম থেকে বিভিন্ন মানুষের আগমনে একটি মিলনের ঐকতান সৃষ্টি হয়। গ্রামীণ মেলা মানেই কোনো না কোনো যাত্রা দলের আগমন। সুতরাং সাময়িক বিনোদন পেতে গ্রামীণ সমাজের শিল্পপ্রিয় অনেক ব্যক্তিই আসে মেলায় আসা বায়োস্কপ বা যাত্রা দেখতে। কিত্তনখোলা মেলাতেও যাত্রাদলের আগমন ঘটে। ইদু কন্ট্রাকটরের মাধ্যমে সুবোল ঘোষের যাত্রাদলের আগমন। এক্ষেত্রে নাট্যকার প্রসঙ্গক্রমে এ নাটকে যাত্রা শিল্পের অতীত প্রসঙ্গ থেকে মিথ ব্যবহার করে মিথের মিথস্ক্রিয়া করেন। কেননা যাত্রাশিল্প বাঙ্গালির ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। শামছল বয়াতীর মুখ দিয়ে কৌশলে বাংলা-জনপদের মধ্যযুগের সমৃদ্ধ

ঐতিহ্যের কিস্‌সা শুনিয়েছেন। বাঙালির প্রাচীন ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্য্যের *সয়ফল মুলুক বদিউজ্জামাল*, *মহুয়া পালা*, *রহিম-রূপবান পালা* প্রভৃতি। শামছল বয়াতীর পুথির আসর প্রমাণ করে, বাংলার অতীত ঐতিহ্য অম্লান। বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারক-বাহক, দর্শক-শ্রোতা মোনাই বাবার মেলায় আগত গ্রামীণ জনগণ। মেলাকে কেন্দ্র করে নাট্যকার কৌশলে পুরাণাশ্রিত ঘটনাকে উল্লেখ করছেন এভাবে—

> শামছল বয়াতি। বাঁশি নিল মন্দ হলো। মামি হয়া কুল ডুবালো।
> হাশেম। কুল ছাপায়া নদী বইলো। তাতে পীরিত ধন্য হলো।
> শামছল। পীরিত বটে ধন্য হলো। বানের পানি দ্যাশ ভাসলো। গরিব লোক উপাস মরলো।
> হাশেম। তাতে রাধার কি হইলো।
> শামছল। তোমার যেমন দশা হইলো।
> হাশেম। আপনে যদি কৃষ্ণ হবেন। আমি রাধা হইতে রাজি। মিঞা বাইরা অক্ষণে যান ডাইকা আনেন এট্টা কাজী।
> শামছল। রাধা হওনের অনেক জ্বালা–গলাতে কলঙ্কের মালা–আরে তাইতো তোমার করি মানা এমন প্রেম আর কেউ কইরো না
> হাশেম। আচ্ছা। তা রাধা হওনের জ্বালাটা কি।
> শামছল। তুমি যদি রাধা হইলা মামার কাছে যাওগে চইলা। আইসো ঘাটে কলসী কাঁখে উতাল হও বাঁশির ডাকে।
> হাশেম। আরে আরে ভাইগনা আমার বড়ই দরদ দেখি মামার।
> শামছল। আগে তুমি হওগা মামি পরে কৃষ্ণ হইমু আমি। (দীন ২০১৩: ৪৪৫)

কবির লড়াইয়ের মাধ্যমে রাধা-কৃষ্ণের কাহিনী উপস্থাপন করে নাটকের সাথে দর্শককে আরো কিছুটা আপন করে নেওয়া হয়। কারণ পৌরাণিক ঘটনা তো সবারই জানা। তাই পুরাণ অবলম্বন করে কোনো গল্প বা ঘটনা খুব সহজে দর্শককে কাছে টানে। তাই নাট্যকাহিনীর মধ্যে অন্য আরেকটি পরিবেশ সৃষ্টি করে নাট্যকার রাধা-কৃষ্ণের ঘটনাকে সংযুক্ত করেন। ফলে নাটকের আবহ বিঘ্নিত হয় না। মনে হয় যেন নাটকের জন্য মিথ সংশ্লিষ্ট কাহিনী সৃষ্টি অপরিহার্য ছিল।

নাটকে সুবল ঘোষ যাত্রাদলের সাথে সম্পর্কযুক্ত সুবল ঘোষই যাত্রাদল চালায়। বাড়ির কর্তা যেমন সংসার চালাতে গিয়ে নানা সমস্যায় পড়ে, সুবল ঘোষও তেমনি যাত্রাদল চালাতে গিয়ে একটার পর একটা সমস্যায় জড়িয়ে পড়ে। ছয় বছর ধরে সে একটানা যাত্রাদলটি ধরে রেখেছে। যাত্রাদলটি এখন একটি পারিবারিক অবয়ব ধারণ করে টিকে আছে। এই পরিবারের সদস্য রবিদাস, ছায়ারঞ্জন, বনশ্রীবালা প্রমুখ। রবিদাশ একজন দক্ষ অভিনয় শিল্পী। স্বাধীনতা যুদ্ধে পিতা-মাতাকে হারিয়ে ছায়ারঞ্জন অল্প বয়সে আশ্রয় নেয় সুবল ঘোষের কাছে। আর বনশ্রীবালা বেশ্যাবৃত্তি থেকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের প্রত্যাশায় আশ্রয় পায় যাত্রাদলে। যাত্রাদলের বাইরে সোনাই স্থানীয় কৃষক। এ নাটকে একদিকে মেলায় আসা যাত্রাদলের সদস্যদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাত, অন্যদিকে মেলায় আসা লাউয়া সম্প্রদায়ের নৌকাবহরের মানুষজনের ঘটনাও এতে জড়িয়ে পড়েছে। এর বাইরে আছে ইদু কন্ট্রাক্টর এবং সোনাইয়ের দ্বন্দ্ব। মূলত এই ত্রিধারার

কাহিনীকে অবলম্বন করে ঘটনা আবর্তিত হয়েছে। সব ঘটনার কেন্দ্রস্থল কিত্তনখোলার মেলা।

এতদ্ব্যতীত শামছল বয়াতী ও তার শিষ্য মংলা বয়াতীর আলাপচারিতা ও পরিবেশনায় গাঁথা, মঙ্গলকাব্যসহ পুথিসাহিত্যের জগৎ আবিষ্কৃত হয়। সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল, 'নদের চাঁদ', 'লখিন্দর', 'চাঁদ সওদাগর'; এছাড়াও আছে অজানা 'অলোমতির পুথি'। চৈনিক মিথের ফিনিক্স পাখির প্রসঙ্গ এ দেশে বহুল প্রচলিত থাকলেও নিজস্ব পরিমণ্ডলে উক্ত পাখিটির কথা বিস্মৃত প্রায়। শামছল বয়াতীই সে পাখিটিকে চেনায়, তা হীরামন, শুক বা ময়ূরপঙ্খী নয়—

> এমতে নাচিয়া যদি পুরায়ন্ত আশ।
> দুই পাখে কাষ্ঠপুঞ্জে করয় বাতাস
> দৈবগতি কাষ্ঠপুঞ্জে লাগায় আগুনী।
> সেই অগ্নি মধ্যে পংখী পোড়ায় আপনি ॥
> ধোঁয়া নাই সেহি অগ্নি সক্কলে জানি।
> সেই স্থানে পোড়ে পংখী জীবন পরানি ॥ (দীন ২০১৩: ৪৪৮)

আলাওলের *পদ্মাবতী*'র "কাকুনুস" পাখির বয়ান অংশের অনুসরণে লিখিত এ-অংশ সম্পর্কে নাট্যকার বলেন—"এটি সম্ভবত: পৌরাণিক ফিনিক্স পাখি। আধুনিক বাঙালি কবিরা আলাওলের এ পাখিটির দিকে ফিরে তাকাননি।" (দীন ২০১৩: ৪৪৮) মধ্যযুগের অমর স্রষ্টা মহাকবি আলাওল রচিত *পদ্মাবতী* কাব্য বর্ণিত কাকুনুস পাখীর বয়ানও এ নাটকে অভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। কেননা চাঁদ রূপান্তরিত হয় প্রতিদিন, নদী নিরন্তর বয়ে চলে। তারও আছে জোয়ার-ভাটা, চর, কূলভাঙা-প্লাবন ও শীর্ণতা। এই তেতো লবণাক্ত জীবনের বাঁকে বাঁকে মানুষের জন্য অপেক্ষা করে রূপান্তর। সামাজিক মানুষের এই রূপান্তরের পালা উপস্থাপিত হয় কিত্তনখোলারূপী মোলায়। নাট্যকার আলোচ্য সংলাপে উল্লেখ করেন—

> শামছল। সেই না পঙ্খীর জাহেরি নাম হয় গো কাকুনুস। হ্যাঁ কও
> দোহার। সেই না পঙ্খীর—ইত্যাদি।
> শামছুল। বাতুনিতে সেই না পঙ্খী নাম হচ্ছে তার মানুষ।
> দোহার। বাতুনিতে সেই না—ইত্যাদি।
> শামছল। আগুন হচে মরণ তাহার ডিম হচে তার বংশ।
> দোহার। আগুন হচে মরণ তাহার—ইত্যাদি।
> শামছল। আকাল উকাল ঝড় তুফানে কভু না হয় ঢংশ।
> দোহার। আকাল উকাল ঝড় তুফানে— (দীন ২০১৩: ৪৪৯)

কাকুনুস পঙ্খীর ব্যাখ্যায় শামছল বয়াতী বলে—

> সোনাই কাকুনুস পঙ্খীর হাস্তর শুইনা আমার কেমুন জানি নাইগা উঠল। আপনে কইছিলেন কাকুনুসের বাতুনি নাম হইতাছে মানুষ। তাহলে যে পঙ্খী ছাইর মদ্যি থিক্যা ফির জরম লয় হেইডা কি আগের পঙ্খী—

> শামছল। তা কেমনে হবে।—হেইডা আগের পঙ্খীর বংশ।
> সোনাই। তাইলে কুনটায় হাচা—বাঁচন না মরণ।
>
> শামছল। জিনিসটা এট্টু কঠিন। এ হইতাছে রূপ বদলের লড়াই বাবা। এক রূপ চিরদিন থাকে না। তও পঙ্খীটার পালকে মরণ বাবা কিন্তুক তার লউ-এর মদ্যি বাঁচন।—লউ ছাড়া কাকুনুসের ডিম পয়দা হইলো কেমনে।
>
> সোনাই। যদি বাঁচনডাই সত্য হয় বাবা—তাহলে বাঁইচা থাইকা সুখ পাইলাম না ক্যান। (দীন ২০১৩: ৪৫৯)

শেষপর্যন্ত শামসল বয়াতীর কাছে করা সোনাইয়ের এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া সহজ কথা নয়। জীবন ও জীবিকার অনিশ্চিয়তা, অচরিতার্থ প্রেম, আর্থ-সামাজিক বিরুদ্ধতাই তার আসরে মূর্ছা যাওয়ার কারণ। কিন্তু কাকুনুস পঙ্খীর মতই তার মরে গিয়ে বাঁচা সম্ভব কিনা এ নিয়ে সংশয় থেকেই যায়। কেননা বংশপরম্পরায় পরিবাহিত রক্তই তো সোনাইয়ের দেহে, সুতরাং বলা যেতেই পারে এই রক্তই নতুন মানুষ সৃষ্টিতে রূপান্তরিত হয়। এতদ্ব্যতীত নাট্যকার সেলিম আল দীন এ নাটকে অত্যন্ত সচেতনভাবে ডোম-লাউয়া সম্প্রদায়ের চরিত্রগুলো উপস্থাপন করেছেন। ইসলাম ধর্মে বর্ণিত মুসলিম জাতির পিতা ইব্রাহীম নবী ও নমরুদের ঘটনা প্রায় সকলেরই জানা। নাট্যকার উক্তধর্ম প্রসঙ্গ থেকে লাউয়া শ্রেণির জন্মের ইতিহাস ডালিমন এবং রুস্তমের মাধ্যমে উল্লেখ করে নাট্যকাহিনীকে আরো কিছুটা গতিশীল করেন। *কিত্তনখোলা*'র পরিণতি এই দৃশ্যে লক্ষ করা যায় বিভিন্ন গোষ্ঠী-সম্প্রদায়ের মানুষ জীবন-জীবিকার সন্ধানে দেশান্তরিত হচ্ছে। এখানে নাট্যকার বিশেষ গুরুত্ব সহকারে দেখিয়েছেন তারা স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে এবং জীবিকার তাগিদে পেশা ও জাতিগত রূপান্তর ঘটছে। কেউ কেউ পৈতৃক বৃত্তি, ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী-সম্প্রদায় এমনকি স্বীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য-সংস্কৃতিও ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে। তবে নাট্যকার লাউয়া সম্প্রদায়ের জন্ম ইতিহাস সম্পর্কে উল্লেখ করেন—

> ডালিমন। রুস্তম ভাই। নিজের জাতেরে গাইল পাড় ক্যান। তুমি চইলা যাবা। আর ঘেন্না কইরা হেই জাতের মদ্যি আমি কেমনে থাকুম।
> রুস্তম। লাউয়াগো জরম কেমনে হইছে জানস না। নমরুদের গোলাম আছিল তারা-ইবরাহীম নবীর দুশমন
> ডালিমন। জানি
> রুস্তম। নবীরে মারণের লাইগা খুঁটায় বানছিল নমরুদ। সেই খুঁটার কাছে আমাগো মানুষেরা জেনা করছিল। করছিল ক্যান।
> ডালিমন। জানি।
> রুস্তম। ক্যান করছিল জেনা। যাতে ইব্রাহীমরে মেলা মাইরা আগুনে ফালান যায়।
> ডালিমন। চুপ কর। চুপ কর। জরম ফিরাইতে পার তুমি। ভাল মন্দ আমাগো পূব্ব পুরুষের—আমাগো কিয়ের দুষ। (দীন ২০১৩: ৪৯৭)

ইব্রাহীম (আঃ)কে অগ্নিতে নিক্ষেপকালে অগ্নিকুণ্ডলীর পাশে জেনা সম্পর্কে ইসলাম ধর্ম মতে একটি পুরাণ প্রচলিত আছে। উক্ত পুরাণ থেকে জানা যায়, নমরুদ ইব্রাহীম (আঃ)কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপকালে এক সমস্যার সৃষ্টি হয়। সমস্যাটি হলো আগুনের

অতিরিক্ত উত্তাপের ফলে ইব্রাহীম (আঃ)কে অগ্নিতে নিক্ষিপের নিমিত্তে নির্মাণকৃত চরকের কাছে পৌঁছানো যাচ্ছিলো না, এমনকি চরক ঘুরানোও সম্ভব হচ্ছিলো না। কেননা ইব্রাহীম (আঃ)কে রক্ষা করার জন্য আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতারা চরকের এক পাশ ভর করে ছিলো। তখন নমরুদ শয়তানের প্ররোচনায় কিছু পতিতা নিয়ে এসে চরকের পাশে বসিয়ে পতিতাদের নগ্ন করে এবং তার গোলামদের দ্বারা উন্মুক্তভাবে জেনাহ করার নির্দেশ দেয়। উক্ত দৃশ্য দর্শনে ফেরেশতাগণ লজ্জায় চরক ও অগ্নিকুণ্ড ছেড়ে সরে দাঁড়ায়। অতঃপর নমরুদ ইব্রাহীম (আঃ)কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপে সক্ষম হয়। ডালিমন এবং রুস্তমের উপরিউক্ত সংলাপে লক্ষ করা যায় প্রাগৈতিহাসিক কালের উল্লেখযোগ্য একটি মিথকে আকারে-ইঙ্গিতে নাট্যকার প্রকাশ করেছেন *কিত্তনখোলা* নাটকে। নমরুদের গোলামদের সাথে লাউয়া সম্প্রদায়ের জাতিগত বা নৃতাত্ত্বিক যে সম্পর্কটি রয়েছে তারই ইঙ্গিত প্রদান করেছেন সেলিম আল দীন। ডালিমন আর রুস্তমের সংলাপে উল্লেখযোগ্য একটি মিথের মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে নাট্যকার এখানে লাউয়া শ্রেণিকে আবিষ্কার এবং তাদের জীবন ও প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে সাম্প্রতিক সময়ের সাথে যুক্ত করেছেন সাবলীলভাবে। তবে নাট্যকার সেলিম আল দীন উল্লেখ করেন, "লাউয়াদের জাতিতত্ত্বে উল্লিখিত ঘটনাটি তাদের চরিত্রচেতনায় কি প্রভাব ফেলেছে তা নিয়ে আরও বিস্তর গবেষণা প্রয়োজন।" (দীন ২০১৩: ৪৯৭) লাউয়া সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ডালিমন দুঃখ-দৈন্য-দারিদ্রের সাথে সংগ্রাম করেছে কিন্তু সে স্বভূমি, স্ব-জাতির ঐতিহ্য-সংস্কৃতি ত্যাগ করে নি। ডালিমন স্বকণ্ঠে নিজের জাতিগত অবস্থান প্রকাশ করেছে এভাবে, "লাউয়ার মাইয়া ডাঙায় কুনদিন ঘর বান্ধে না। বানতে চাইলেও পারে না।" (দীন ২০১৩: ৪৯৬) অথচ লাউয়া সম্প্রদায়ের রুস্তম নতুন জীবনের সন্ধানে সম্প্রদায়গত অহং ও ঐতিহ্য বিসর্জন দিয়ে দুখাইপুরে চলে যেতে দ্বিধা করে নি। রুস্তম শুধু জলের বসতি ত্যাগ করে নি; সে তাদের জাতিগত বৃত্তিও ত্যাগ করেছে এবং গ্রহণ করেছে সাপুড়ে পেশাবৃত্তি। আর সোনাই গেরস্থি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে; জমিজমা হারিয়ে রুস্তমের সাথে দুখাইপুরে সাপুড়ে সেজেছে। শেষপর্যন্ত সোনাই ও রুস্তম রূপান্তরের মাধ্যমে সাপুড়ে হয়ে যায়।

এতদ্ব্যতীত নাট্যকার এ নাটকে মনসা মিথকেও বিভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যবহার করেছেন, যা নাটকের কাহিনীর সাথে সমান্তরাল ও অপরিহার্য। বনশ্রী পালিয়ে এসেছিলো বেশ্যাপল্লী ছেড়ে সুন্দর একটি জীবনের আশায়। বনশ্রীবালা তার প্রেমিকের কাছে হতে চায় মনসা। শক্তিহীন নারী মনসা হয়ে নিজের পরিবর্তন চায়। সেলিম আল দীন মনসা মিথকে জীবনপ্রবাহের সমান্তরালে উপস্থাপন করে নাট্যঘটনায় আরো কিছুটা ভিন্নতা সৃষ্টি করেছেন। হিন্দু পুরাণে দেবী মনসা সম্পর্কে উল্লেখ আছে, যে মনসা হল পূর্ববঙ্গের অনার্য দেবী, আর্য দেবতা শিবের সঙ্গে যার দ্বন্দ্ব। সেই দ্বন্দ্বের খেসারত দিতে হয় বেহুলাকে তার স্বামী লখিন্দরকে সাপে কাটে বাসররাতে। কারণ তার শ্বশুর চাঁদ সওদাগর মনসাকে পূজা দিতে রাজি নয়, তিনি শিবভক্ত। দেবী মনসার অভিশাপে সাপের কামড় খেয়ে একে একে মারা যায় চাঁদ সওদাগরের ছয় সন্তান। কষ্ট বুকে চেপে

তাদের সবাইকেই ভেলায় করে নদীতে ভাসিয়ে দেয় চাঁদ সওদাগর আর তার স্ত্রী। হৃদয়বিদারক এই পরিস্থিতিতে দেবী মনসা পুনরায় গিয়ে দাঁড়ায় চাঁদ সওদাগরের সামনে। চাঁদ সওদাগর তার সিদ্ধান্তে অটল থাকে। কঠিন তার হৃদয়। দেবী মনসা তার শেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করে। স্বর্গে গিয়ে দুই নর্তক-নর্তকীর সাথে পরিকল্পনা সম্পন্ন করে। ইন্দ্রের রাজসভার এই দুই নর্তক-নর্তকী মানুষ রূপে জন্ম নিবে পৃথিবীতে। নর্তক অনিরুদ্ধ চাঁদ ও তার স্ত্রী সনকার ঘরে জন্ম নিলো লখিন্দর হয়ে। আর নর্তকী ঊষা জন্ম নিলো আরেক পরিবারে বেহুলা হয়ে। পরিণত বয়সে এই লখিন্দর পড়লো অনিন্দ্যসুন্দরী বেহুলার প্রেমে। দুই পরিবারের সম্মতিতে বিয়ে হলো বেহুলা-লখিন্দরের। এখানে বনশ্রীবালা চরিত্রের মধ্য দিয়ে নারীত্বের দ্বন্দ্ব *কিত্তনখোলা* নাটকের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। সুবল দাস বনশ্রীকে বেহুলা চরিত্রে অভিনয় করতে বললেও বনশ্রী মনসা চরিত্রে অভিনয় করতে পছন্দ করে। পুরাণে লক্ষ করলে পাওয়া যায় বেহুলার সতীত্ব ও স্বামীভক্তির জয় হয়, লখিন্দরকে সে বাঁচাতে সমর্থ হয়, বিনিময়ে চাঁদ সওদাগর মনসাকে পূজা করতে স্বীকৃতি জানায়। অন্যদিকে, দেবী হবার পরও মনসার জন্ম দুর্ভাগ্য নিয়ে, তার বাসররাতও ভেঙ্গে গিয়েছিলো। নাট্যকার বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল থেকে উল্লেখ করেন—

> বনশ্রী। কামারের বোলে পদ্মা জ্বলিলেক কোপে
> অতি ক্রোধে পদ্মাবতী থর থর কাঁপে।
> দেবী মূর্তি এড়িয়া নাগ মূর্তি ধরে
> সহস্র ফণা হইল দেখিতে ভয় করে। কোপ মনে পদ্মাবতী করে ছটফট
> আচম্বিতে বামে দেখে মহা বৃক্ষ বট।
> ছায়ারঞ্জন। তারপর—তারপর কি হলো।
> বনশ্রী। সেই বট বৃক্ষে দেবী মারিলেন ছোপ।
> প্রলয় অগ্নি যেনো করেছে আটোপ। তেজ বৃন্ত বৃক্ষগোটা—অতি উচ্চকায়
> ভস্ম হইল সেই বৃক্ষ মনসার ঘায়। (দীন ২০১৩: ৪৭২)

পূজা পাবার ব্যাপারে মনসা দুর্মর আকাঙ্ক্ষা ও তার সংহার মূর্তি বনশ্রীকে আকর্ষণ করে। বনশ্রী মনসার সঙ্গে নিজের সাদৃশ্য খুঁজে পায়। বেহুলার সতীত্ব, সংসার, স্বামীভক্তি বনশ্রীর জীবনের সঙ্গে খাপ খায় না। সে এসেছে পতিতাপল্লী থেকে, সংসার করা তার সাজে না, ইদু কন্ট্রাক্টরের মতো লোকেরা তাকে বিছানায় নিতে চায়। আলোচ্য সংলাপে বনশ্রী বালার স্বকণ্ঠে উচ্চারিত হয় মনসার রূপ ধারণ করা প্রসঙ্গ—

> সোনাই। মনসার পুথি—অষ্টামঙ্গলা।
> বনশ্রী । হ। আজ রাইতে লক্ষিন্দরের পালা। আমি বেউলা সাজবো। ইচ্ছা ছিল মনসা সাজি। তা সুবল দা দিল না। মনসার অলঙ্কার কি জানেন।
> সোনাই। হাপ। সোনা-দানা কিছু না খালি হাপ।
> বনশ্রী। হাপ কি। এ্যাঁ হি হি হি। সাপ। সাপ। শুনবেন।
> নেতার বচনে দেবী হাসে মনে মন
> মালিনীর বেশ দেবী ধরিল তখন।

নাগ আভরণ পরে নাগের জটাজুট
কানে কর্ণফুল পরে নাগের মুকুট।
পদ্মানাগের হার পরে শঙ্খনাগের শাঁখা
আড়াই নাগের কাঁচলি পরে সহজে তিন বেঁকা
কটিতে কিঙ্কিণী ভাল শোভিয়াছে ধোড়া।
চরণে নূপুর পরে বিঘাতিয়া বোড়া।
সোনাই। বেউলা সতী। তা থুইয়া মনসা হতি চাস কেন।
বনশ্রী। ছায়া হি হি।
ছায়ারঞ্জন। তুমি বলবে 'সিটা আমার অভ্যাস।'
বনশ্রী। হি হি। এমন পূজা খাগী মাইয়া মানুষ। কবিরে ডাক দিয়া কয় পূজা দেও। চান্দের ছও পূত্ররে নাও বুড়ায়া মারলো কয় পূজা দেও। ছায়া তোমার বন্ধু যদি পুঁথি নেখে তো আমি কি বলবো তারে। হি হি হি। (দীন ২০১৩: ৪৫৮)

বিয়ের রাতেই লখিন্দরের মৃত্যু হবে সাপের ছোবলে এই ভবিষ্যৎবাণী দেবী মনসা অনেক আগেই করেছিলো। তাই চাঁদ সওদাগর তার শেষ সন্তানকে বাঁচানোর জন্য শ্রেষ্ঠ সব কারিগরদের দ্বারা বাসর ঘর নির্মাণের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এমন এক বাসর ঘর নির্মাণ হবে যেখানে দেবী মনসা কোনো ক্রমেই প্রবেশ করতে পারবে না। চাঁদ সওদাগর কারিগরদের আদেশ দিলো লোহার বাসর ঘর নির্মাণ করতে। পুরো নিচ্ছিদ্র হবে সেই ঘর। শুধুমাত্র ঢোকা এবং বের হবার এক দরজা ছাড়া আর কোনোকিছুরই প্রবেশ কিংবা বের হবার পথ থাকবে না। বিপুল সংখ্যক কারিগর নিয়ে কাজ শুরু হলো বাসর ঘর নির্মাণের। দেবী মনসা স্বপ্নে দেখা দিলো এক কারিগরকে। তাকে হুমকি দিলো বাসরঘরে একটা ছোট্ট ছিদ্র রাখবার। তা না হলে ঐ কারিগরের বংশ নির্বংশ করে দিবে দেবী মনসা। স্বপ্নের মধ্যে ভয় পেয়ে কারিগরের ঘুম ভেঙ্গে যায়। কোনো কিছু চিন্তা না করে সে ঐ রাতের আঁধারেই ছোট্ট একটি ছিদ্র করে রেখে আসে বাসর ঘরে। যথারীতি বাসর ঘরে সেই ছিদ্র দিয়ে সাপ ঢুকে পড়ে। দেবী মনসার বিষাক্ত ছোবলে মারা যায় চাঁদ সওদাগরের শেষ পুত্র লখিন্দর। নাট্যকার ছায়ারঞ্জনের জীবনের সমান্তরালে চাঁদ সওদাগর ও লখিন্দর প্রসঙ্গটি এভাবে উল্লেখ করেন—

ছায়ারঞ্জন। থামেন। ওহ্ এ রকম রক্ত ঝরনের কথা শুনলে শীত করে গাও। আমার মাওরে পাঞ্জাবিরা আর বাপেরে বন্দুকের আগার ছুরি দিয়া ফাইড়া ফালাইছিল আর রক্ত। আমার কেউ নাই। কাশেমালির দোকানে হৈ হৈ চলে কিছুক্ষণ। না না। হেঁ হেঁ তা আপনেরে খুব পচ্ছন্দ হয়েছে। যখন চিৎকার করলেন আর কলস ভাঙ্গলেন আমার মনে হলো লখিন্দরের বাপ চাঁদ বণিকের গলা শুনতিছি। চাঁদ বণিক যখন বুঝতে পারল কানি মনসার সুতানলী সাপে লখিন্দরকে ডংশন করছে তখন সে চিক্কার করে বললো। সোনার লখিন যে শত্রু তোমারে ডংশন করছে তারে যদি পাইতাম

সোনাই। লখিন্দরের যাত্রা আমি দেখছি।
ছায়ারঞ্জন। দেখছেন। তাইলে পাঁচটা টাকা দেন। নেশা পুরে নাই টেকা শ্যাষ। (দীন ২০১৩: ৪৪১-৪৪২)

কিত্তনখোলা শেষাবধি গোটা লোকায়ত বাংলার রূপক। শত প্রচেষ্টাতেও কিত্তনখোলা'র নেপথ্য নায়করূপে নিয়তিকে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না, এ নাটকের জীবনমেলার সর্ববিধ

রূপান্তরের ভাগ্যবিধাতা আদতে সুদূরবর্তী ক্ষমতাকেন্দ্র রাষ্ট্রের সর্ববিধ ইতিহাস ও বর্তমান। মূলত তার কেন্দ্রমুখী-পুঁজিতান্ত্রিক আধুনিক নাগরিক বিকাশ অসম বিন্যাসের অভিঘাতে পর্যদুস্ত করেছে লোকায়ত জীবনকে। সেখানে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক জীবন ও আধুনিক রাষ্ট্রের মাঝে পৌরাণিক ত্রিশঙ্কু দশায় লোকমানব, দুই ব্যবস্থাপনাই তার জীবনে প্রতিকূলতার অনিবার্য অসহায়ত্বরূপে অস্তিমান। ভাঙনোন্মুখ সমাজের নির্মম বাস্তবতাকে মিথ প্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে নাট্যকার চিত্রিত করেছেন। সোনাই নবজন্ম লাভ করতে চায় কাকুনুস পাখির মতো তীব্র অনিশ্চয়তার উত্তরণে জীবনের স্বাভাবিক চাওয়াও সেটা। আবার বনশ্রী চায় না কোনো পরিবর্তন। কারণ পরিবর্তন সহজ নয়, বনশ্রীর স্বকণ্ঠে উচ্চারিত হয়,

নাচি না নাচি আমার ব্যাপার। আপনের রাগের কারণটা কি আমরা সীতাও না, বেউলাও না। যদি সিটা ভাবি ভাবি যে আমরা সতী মানষে তা ভাববে না। ভাবে না। (দীন ২০১৩: ৪৯০)

কষ্টের এই ভার নিয়ে চলা বনশ্রী নাটকের অষ্টম সর্গে বিষপানে আত্মহত্যা করে। সোনাই এই হত্যার প্রতিশোধ নেয় ইদুকে খুন করে। ডালিমনকেও ভালোবেসে তার সঙ্গে ঘর বাধা হয় না সোনাইয়ের। অবশেষে রুস্তম ও সোনাই দুজনে দুখাইপুরে চলে যায়। তাদের এ চলে যাওয়াও তো এক ধরনের রূপান্তর। কেননা বনশ্রীর আকস্মিক মৃত্যু নাট্যঘটনায় তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করে কাহিনী ও চরিত্রসমূহকে সর্বশেষ রূপান্তরের দিকে ঠেলে দেয়। তখন শঙ্কা জাগে এতসব মৃত্যু-পরাজয়ের মধ্য দিয়ে নাট্যকার পরাজয়কেই ধ্রুপদী অনিবার্যতায় চিহ্নিত করেছেন। এতদ্ব্যতীত নাটকে মিথ প্রসঙ্গ সংযোজন করে পূর্ব থেকে সমকালীন পর্যন্ত ঘটনা পরম্পরা চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। যেমন আলাওলের *পদ্মাবতী* থেকে চয়নকৃত কাকুনুস পাখির মিথের প্রসঙ্গ উপস্থাপনে সমকালীনতা ফুটে ওঠে *কিত্তনখোলা* নাটকে। কাক্নুস পাখি আগুনে আত্মহননের মধ্য দিয়ে অমোঘ মৃত্যুতে পূর্ণতার স্বাদ নিয়েছিলো, কিন্তু তার দেহভস্ম থেকে জন্ম নেয় নতুন পাখি। জীবনের অমোঘ রূপান্তর মৃত্যুর ভেতর থেকে উক্ত নবজন্মের আকুতি যদি সত্যি হয়, তবে সতত নতুন জন্মেও সম্ভাবনাকে জাগিয়ে রাখে। এই নিম্নবর্গ শোষিত মানুষেরাও হয়তো একদিন ইতিবাচক বাঁচনের তাগিদে প্রতিটি অনিবার্য রূপান্তর-পুনর্জন্মকে ইতিবাচক করে তুলবে। সেক্ষেত্রে নাট্যকার বিপ্লবকে প্রেরণাসূত্র হিসেবে উপস্থাপন করেন। শেষাবধি মিথের মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে *কিত্তনখোলা* নাটকটি সুনিশ্চিতভাবে ভবিষ্যতে পৌঁছিয়ে সমকালকে ধ্রুপদী উচ্চতায় নীত করে।

তথ্যসূত্র

কাদির, সাজ্জাদ (২০১৮, জুন ০১)। মিথ ও কবিতা। *শিল্প-সাহিত্য*।

গালিব, সোহেল আল ও জামিল, নওশাদ (সম্পা.) (২০১০)। *কহনকথা: সেলিম আল দীনের নির্বাচিত সাক্ষাৎকার*। শুদ্ধস্বর , ঢাকা।

ঘোষ, জগদীস চন্দ্র (সম্পা.) (১৯৮৯)। *শ্রীগীতা*। প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী, কলকাতা।

তুলু, আবু সাঈদ (২০১৮)। *সেলিম আল দীনের সাহিত্য ভাবনা*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

দীন, সেলিম আল (২০১১)। *রচনাসমগ্র ২*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

দীন, সেলিম আল (২০১৩)। *নাটক সমগ্র ১*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমহান (২০১২)। মিথ প্রসঙ্গ: সংজ্ঞা ও স্বরূপ। কুন্তল মিত্র (সম্পা.), *দোতারা*। কলকাতা।

ভট্টাচার্য, দেবিদাস (১৩৮৯)। *বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস*। বরুণা প্রকাশনী, কলকাতা।

রহমান, লুৎফর (২০০৯)। *কালের ভাস্কর সেলিম আল দীন*। রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা।

হাসান, অনুপম (২০০৮)। সেলিম আল দীন-এর নাটকে প্রান্তিক মানুষ ও সমাজ-জীবন। হাসান শাহরিয়ার (সম্পা.), *থিয়েটারওয়লা*। ঢাকা।

Franklin, H.B. (1963). *The wake of the Gods: Melville's Mythology* . Stanford University Press, California.

Leach, Maria (Edit.) (1972). *Standred dictionary folkore, Mythology and Legend*, Harper & Rowpublishers, London.

Robinson, Mairi (Edit.) (1996). *Chambers 21stcentury Dictionary*, Alhied Chambers Limited, New Delhi.